**সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : নজরুলের ছোটগল্প**

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাঙালি সমাজের জাগরণের কবি, মুক্তির কবি ও স্বাধীনতার কবি। তিনি আমাদের আলো – বাঁচার আলো। তিনি সমগ্র বাঙালির প্রেরণা। সমগ্র বাঙালির ইতিহাসে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না যিনি এমনভাবে পুরো জীবনভর মানুষের জয়গান ও মুক্তির কথা বলেছেন। বাংলার সাহিত্যে এমন অন্য কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এরকম নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। তাই একুশ শতকে নজরুলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিতা বারবার আমাদের চিন্তাজগতে জোরালোভাবে অনুভূত হয়।  
কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবি ও লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সার্বিক অর্থে একজন জনদরদি মুক্তিকামী মানুষ। ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মাত্র ২৩ বছর ছিল নজরুলের কর্মময় সময়। এ কর্মময় সময়টুকুতে তাঁর সৃষ্টি সাধনার মূলে দেখতে পাই মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও মুক্তির প্রেরণা। এসবের তাড়নায় নজরুল জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে, সংগঠনে, শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে, সাংবাদিকতার জগতে। নজরুলের রাজনীতি-প্রভাবিত শিল্প-সাহিত্য বাঙালি মানসে প্রেরণা জুগিয়েছে নিরন্তর। বিশ্বের, বিশেষ করে ভারতের, এক অস্থির রাজনৈতিক মুহূর্তে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন। ভারতে তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন – মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন – জোরদার হয়ে ওঠে। সেই সময়ে নজরুলের সাহিত্যকর্মের মূল প্রেরণাই ছিল রাজনীতি। সময়ের সেই উত্তাল তরঙ্গে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ব্যথার দান (১৯২২), অগ্নিবীণা (১৯২২), যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), রিক্তের বেদন (১৯২৫), চিত্তনামা (১৯২৫), ছায়ানট (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), পুবের হাওয়া (১৯২৬), ঝিঙে ফুল (১৯২৬), সর্বহারা (১৯২৬), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্র-মঙ্গল (১৯২৭), ফণি মনসা (১৯২৭), বাঁধন হারা (১৯২৭), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৮), বুলবুল (১৯২৮), জিঞ্জির (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), চোখের চাতক (১৯২৯), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০), নজরুল গীতিকা (১৯৩০), ©র্ঝলিমিলি (১৯৩০), প্রলয়-শিখা (১৯৩০) এবং শিউলিমালা (১৯৩১)। এছাড়া তিনি নবযুগ (১৯২০), ধূমকেতু (১৯২২) ও লাঙ্গলের (১৯২৫-২৬) হাল ধরেন। নজরুল ইসলামের কলম শাণিত হয়ে ওঠে দখলদার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।  
নজরুলের আরেক পরিচয় তিনি নাট্য ও গদ্যশিল্পী। গল্প দিয়েই শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্যচর্চা; তারপর তিনি এসেছেন কবিতা ও গানের এক সম্পূরক ভুবনে। ছোটগল্প, দীর্ঘগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কলাম, অভিভাষণ বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপনযোগ্য নাটক ও নাট্যরচনা – ইত্যাকার মাধ্যমে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এর অধিকাংশই সময়ের দাবির সঙ্গে তাল রেখে এবং কতকাংশে নিজের শিল্পদৃষ্টির পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে। নজরুলের সমগ্রত্বের বিবেচনায় এসবই প্রাসঙ্গিক – বিশেষত তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প ও ভাষণ-অভিভাষণমালা। (হুদা : ১৯৯৯)  
কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রায় দুই দশকের সাহিত্যিক জীবনে মাত্র তিনখানা গল্পগ্রন্থে (ব্যথার দান, রিক্তের বেদন এবং শিউলিমালা) আঠারোটি ছোটগল্প গ্রথিত হলেও তাঁর প্রতিটি গল্পের সুর যেন এক। সব গল্পের মূলেই রয়েছে অকথিত এক ব্যথার কাহিনি, প্রতিটি গল্পই যেন আন্তরিক বেদনার রঙে রঙিন। তাঁর এসব গল্পের সমাজতত্ত্ব এ-প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত নজরুলের গদ্যের সমাজতত্ত্ব নিয়ে খুব বেশি বিশ্লেষণ দেখা যায় না। এ সামান্য আলোচনাও সময়জীর্ণ এবং দীপ্তিহীন। (ইসলাম : ১৯৯১)  
আমরা সকলেই জানি নজরুলের জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে পদানত ভারতে। সেই একেবারে শুরু থেকে নজরুলের মধ্যে তীব্র দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার চেতনা প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ব্যথার দানের প্রথম গল্প ‘ব্যথার দান’ দারুণ একটি দেশপ্রেম ও ভালোবাসার কাহিনি। জীবনের প্রথম গ্রন্থেই নজরুল মাতৃভূমিকে মায়ের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, ‘তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে, – মাকে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মার চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি।’ (ব্যথার দান, পৃ ৫) এ-গল্পের আরেক স্থানে বলেন, ‘সে বলছে, পরাধীন লোক যত কমে, ততই মঙ্গল।’ (পৃ ১৬) এতে আমরা দেখতে পাই দেশের প্রতি ভালোবাসা। পরাধীনতার গ্লানি ও যন্ত্রণা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। দখলদার ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ যে আমাদের অন্ধ ও বধির করছে তাও নজরুলের লেখায় ও চেতনায় ধরা পড়েছে। তাই তিনি উপহাস করে বলেন, ‘আমি সে দিন হাসতে হাসতে বললাম, হ্যাঁ তাই, এই যে, তুমি অন্ধ আর বধির হয়ে গেলে একে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস ভাবছ কি?’ (পৃ ১৭)।  
উপনিবেশ শুধু ব্যক্তি-মানুষকে, সমগ্র জাতিকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় ঠেলে দেয়, পঙ্গু করে, হতাশাগ্রস্ত করে, আতঙ্কিত করে এবং রোগব্যাধির মধ্যে নিমজ্জিত করে। জাতির মনোজগতে অন্ধকার চাপিয়ে দেয়। ঔপনিবেশিক যুগ এক ভয়ংকর কাল – ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে চলে সক্রিয় ভাঙন এবং দ্রুত নির্মাণের পালা। মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়। সে পালাতে চেষ্টা করে, আপস করে, বিদ্রোহ করে। তৈরি হয় বহুরূপী জীবনশিল্প। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয় প্রেমে, হিংসায় এবং বিদ্বেষে। ব্যক্তির অস্থিরতার মধ্যে কাজ করে আশা, আতঙ্ক, লোভ প্রভৃতি বোধ। বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং ব্যাধির কালো ছায়া, নেমে আসে ঘাতক, খাজনাওয়ালা মহাজনের নিষ্পেষণ। (ইসলাম : ১৯৯১)।  
নজরুলের প্রথমদিকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প ‘রাজবন্দীর চিঠি’। এতে চিঠি লেখক শ্রীধূমকেতু। এই ধূমকেতুকে স্বয়ং নজরুল বলেই মনে করা যায়। ধূমকেতুর মনে এত ভালোবাসা, এত প্রেম, এত অভিমান তা অধিকাংশকে না ভাবিয়ে পারে না। চিঠি আকারে লেখা এ-গল্পটি ঔপনিবেশিক সময়ের মানস ও সমাজচিত্র। ব্রিটিশ দখলদার শোষক-নিপীড়ক শ্রেণির প্রায় অন্তিমকাল। দেশপ্রেমিক তরুণ জেলে – রোগে আক্রান্ত আর সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করছে। তখন সারা ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর আকার ধারণ করছে। দেশের তরুণসমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে আর জেলে যাচ্ছে। তাই ধূমকেতু তার প্রিয়াকে জানানোর ছলে সমগ্র জাতিকে জানাচ্ছে – ‘কিন্তু বড় বেদনায় প্রিয়, বড় বেদনায় আমায় এত বড় বিদ্রোহী এত বড় স্বেচ্ছাচারী উন্মাদ করে তুলেছে।’ (‘রাজবন্দীর চিঠি’, পৃ ৬৪)  
সাহিত্যের বড় কাজ হলো মানুষের মনে জাতীয় চেতনা ও কল্যাণবোধ জাগিয়ে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সমকালীন চিন্তাধারাকে জনমনের সামনে তুলে ধরা। ধূমকেতু তার চিঠির মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি জাতিকে বলার চেষ্টা করেছে – জাগো-জাগো। সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করা – মনকে শুধু মুগ্ধ করা নয়, হৃদয়কে জাগিয়ে তোলা। (ফজল : ২০০৮) নজরুলের সমস্ত লেখাই জাগরণমূলক। তাই তিনি জাগরণের কবি, মুক্তির কবি।  
নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ রিক্তের বেদন। ‘রিক্তের বেদন’ গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে আবেগপ্রবণ প্রেমের কথাতে ভরপুর দেখালেও তাতে গভীরে কোনো প্রেম তীব্র আকারে লুকানো আছে। কোমল হৃদয়ের পাশাপাশি কঠিন দিকনির্দেশনা আছে। পরোক্ষে বলা হয়েছে ভালোবেসে ত্যাগের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা। তাই তো লেখক বলছেন, ‘পারবে? বাঙলার সাহসী যুবক! পারবে এমনি করে তোমাদের সবুজ কাঁচা তরুণ জীবনগুলি জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতে দেশের এতটুকু সুনামের জন্যে? তবে এস। এস নবীন, এস! এস কাঁচা এস। তোমরাই তো আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সব! বৃদ্ধদের মানা শুনো না।’ (‘রিক্তের বেদন’, পৃ ৭৯) এখানে প্রথম ভাঙার কথা আছে। বিধিনিষেধ অমান্য করার ডাক। খাঁটি শিল্প সবসময়ই বিপ্লবী, যা স্থাপিত বাস্তবতাকে আক্রমণ করে এবং মুক্তির পথ নির্দেশ করে। (ইসলাম : ১৯৯১)  
‘মেহের নেগার’ নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে রচিত হলেও একটা ঐক্য সমপর্যায়ের বাণী বহন করে। স্বাধীনতার বাসনা ও বিরহের বেদনা সমতালে বেজে ওঠে। অলিখিত একটা ঐক্য যে গোপনে গোপনে কাজ করে। সমাজের পবিত্র-অপবিত্র জ্ঞান – উঁচু-নিচু ভাব, মানে সামাজিক ভেদাভেদ অগ্রাহ্য করার প্রবণতা গল্পটিতে প্রকটিত হয়েছে। সমাজের ভন্ডামি তিনি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছেন। আর সেই ভন্ডদের মুখোশ তুলে ধরছেন – তা বর্তমানেও সত্য। ‘এইসব ছোট মনের লোকেই আবার নিজেদের ‘ঊচ্চ মহান’ ‘বড়’ বলে নিজেদের ঢাক পিটায়।’ (‘মেহের নেগার’, পৃ ১১১) মেহের নেগারের কথক য়ুসোফ খাঁ তাই বীরদর্পে বলেন – ‘শির দিব তবু স্বাধীনতা দিব না।’ (‘মেহের নেগার’, পৃ ১১১) এমন সাহসী কথা কজন লেখক বাংলা সাহিত্যে বলতে পেরেছেন? আমাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রতীক হলেন নজরুল।  
নজরুলের গল্পসমূহের মধ্যে ‘স্বামীহারা’ গল্পটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ-গল্পটির সমাজতত্ত্ব সত্যিকার অর্থেই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এতে সমাজের ঔপনিবেশিক শোষণ ও ব্যাপক মহামারীর বিস্তার সম্পর্কে যেমন বাস্তব বিবরণ আছে আর অন্যদিকে জাত-পাত-বংশমর্যাদা বিষয়ক বিভেদসৃষ্টিকারী ক্ষতিকর দিকটা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজের গভীরে নিহিত ও সামাজিক ব্যাধিকে দেখিয়েছেন ক্ষতিকর হিসেবে। দরিদ্র মহিলা বিধবা হলে তার আর কোনো রক্ষা নেই। বাংলার দলিত নারীর অবস্থা তাই নজরুল ইসলাম সাহিত্যিক বিবরণে চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি সমাজের অবস্থা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, ‘তারা জানত সমাজ শুধু চোখ রাঙাতেই জানে। যে যত দুর্বল তার তত জোরে টুঁটি চেপে ধরতেই সমাজ ওস্তাদ।’ (‘স্বামীহারা’, পৃ ১৩৫)  
নজরুল ইসলাম সাহিত্যকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। জমিদার ও ডেপুটিদের হাত থেকে গণমানুষের কাছে সাহিত্যকে নিজেদের জীবনযাত্রার বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য-সমালোচক আফজালুল বাসার বলেন, নজরুলের মতে, ‘জন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্যে রসের পরিবেশন করা’ – এখানে সাহিত্যকে দর্পণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘চাষীরাও আয়না রাখে; নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন করে রাখে।’ অবশ্য তিনি সাহিত্যে মোড়লি প্রকাশ করতে নিষেধ করেন, ‘সাবধান, আপনাদের মুরুবিবয়ানা ভাব যেন প্রকাশ না পায় তার মধ্যে, তাহলে তারা পালিয়ে যাবে।’ তাঁর মতে, জনসাহিত্য করতে হলে জনগণের আত্মীয় হতে হবে। ভদ্র পোশাকিদের নামতে হবে কাদার মধ্যে। তা না হলে সাহিত্য কৃত্রিম হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন, ‘আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজনীতি – সবই টবের গাছ। মাটির সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জনসাহিত্যের জন্যে জনগণের সঙ্গে যোগ থাকা চাই।’ নজরুলের সাহিত্যসাধনা বিলাস ছিল না। এ ছিল নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে ফেরা। তিনি লিখেছেন, ‘কোনো অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল।’ (বাসার : ১৯৯১)  
‘পদ্ম-গোখরো’ গল্পটি নজরুলের গল্পমালায় কিছুটা পরিমাণে ভিন্ন ধরনের। এ-গল্পে লেখক লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। গুজবের সাহিত্যিক বিবরণ হাজির করেছেন। মানুষের মনে কত ধরনের কামনা-বাসনা হতে পারে, তার একটা দিক লেখক সফলভাবে চিত্রিত করেছেন। ‘পদ্ম-গোখরো’ গল্পের আরিফ আধুনিক মানবিক মানুষ – প্রেমিক মানুষ – চরম ধৈর্যশীল মানুষ। সে জীবনে সহজে অাঁতকে ওঠার মানুষ নয় – বিপদে দিশেহারা হওয়ার পাত্র নয়। অন্যদিকে বংশগৌরব থাকলেও সৈয়দ সাহেব ধীরে ধীরে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকেন। বাড়ির থালাবাটি বিক্রি করে সংসার খরচ চালাতে হচ্ছে। এটাও সমাজের উচ্চবংশীয় লোকজনের বিনাশের চিত্র। ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠন এদেশীয় মীর ও সৈয়দ উভয়ের পতন ও ধ্বংস নিশ্চিত করেছে। আবার সৈয়দ বংশের লোক – মানে আরিফের শ্বশুর পিরও বটে। পিরবংশের লোক সৈয়দ সাহেব জামাতার কাছ থেকে টাকা-পয়সার সাহায্য নেন না বহু অনুরোধের পরও। রাতের অন্ধকারে নিজ কন্যার অলংকার মাতা-পিতা যৌথভাবে চুরি করেছেন। কন্যার অলংকার চুরি করেই অপরাধী কর্মকান্ড বন্ধ হয় নাই, অধিকন্তু কৌশলে জামাতার খাদ্যে বিষও প্রয়োগ করেছেন। এটা পতনশীল ও পচনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য। গল্পের মধ্যে মারাত্মক বাণী রয়েছে – ভয়াবহ তথ্য – তা হলো, কন্যার স্বর্ণের অলংকার চুরি করে সেই টাকায় হজযাত্রা। সুতরাং এই ‘পদ্ম-গোখরো’ গল্পের মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রধান দিক লক্ষ করতে পারি, যথা : সামন্ত সমাজের অধঃপতন আর ধর্মীয় ভন্ডামি। এখানেই লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ।  
‘পদ্ম-গোখরো’ গল্পে সমাজের আরেকটি অন্ধকার দিক দেখা যায়। গ্রামে তখনও জিন-ভূতের উপদ্রব ছিল। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সঙ্গে জিন-ভূতের একটা সম্পর্ক যাচ্ছে। শহরে ধনী ও শিক্ষিত লোকদের জিনে-ভূতে পায় না। জিনে আর ভূতে ধরে অশিক্ষিত দরিদ্রকে। এটাও অনুন্নত ও অশিক্ষিত সমাজের বৈশিষ্ট্য। লেখক জানাচ্ছেন, ‘সেইদিনই সন্ধ্যায় রাত্রিতে একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল ‘ও মা গো, ভূতে ধরলো গো। জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!’ বলিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।’ (‘পদ্ম-গোখরো’, পৃ ১৫৯) মজার বিষয়, বাসার দাসীই ভূত-জিন দেখে, অন্য কেউ নয়। অথচ পরক্ষণেই লেখক বলছেন, জিন-ভূত কিছুই না। সে তো জোহরার বাবা – আরিফের শ্বশুর। জিন-ভূত গরিবের ব্যাধি। অশিক্ষিত সমাজের ব্যাধি। লেখক ঠিকই সমাজের ব্যাধি যথার্থভাবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন। ভৌতিক আবহে বাস্তবই বর্ণনা করেছেন। ‘মহৎ লেখাই একমাত্র গোষ্ঠীর যৌথ চেতনার উপাদানগুলোকে সবচেয়ে বেশি সুসংহতভাবে তাঁর কল্পনার মধ্যে বিধৃত করতে পারেন এবং তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন।’ (ইসলাম : ১৯৯১)  
‘জিনের বাদশা’ গল্পটি নজরুলের সর্বাপেক্ষা পরিপক্ব গল্প। গল্পটির সমাজতত্ত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিদীপ্ত। গল্পটির পাত্র-পাত্রীর নামকরণও একটা গভীর চিন্তাশীল বিষয় ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। ‘জিনের বাদশা’ গল্পটির মাধ্যমে লেখক বহু ধরনের বার্তা পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেছেন।  
চুন্নু ব্যাপারী একজন মুসলমান বেপারি। একজন মুসলমান চাষি। তাঁর তিনটা বউ ও সাতটা ছেলে। এ-গল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ মুসলমান সামাজে পুঁথির একটা প্রভাব আছে তাও লেখক জানিয়েছেন। গল্পের নায়ক আল্লারাখা নিজেকে সোনাভানের পুঁথির গাজী হানিফার সঙ্গে তুলনা করে। আল্লারাখা তেমন শিক্ষিত না হলেও তার সাহস বেশ। সে যতই দুরন্ত প্রকৃতির হোক না কেন তার হৃদয় কিন্তু ঠিকই প্রেমিক হৃদয়। নানাভাবে নানা উপায়ে সে তা প্রমাণ করেছে।  
গ্রামীণ কৃষক সমাজের মধ্যে প্রচলিত জিন-ভূতের ধারণার চমৎকার প্রয়োগে লেখক সমর্থ হয়েছেন। গ্রামীণ মানুষের সমাজে ও মনোজগতে জিন-ভূতের ধারণা কীভাবে কাজ করে তা ‘জিনের বাদশা’ গল্পে লেখক আন্তরিকভাবে তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে, বাস্তবে জিন-ভূত বলতে কিছুই নেই। তা হলো, মানুষের কামনা-বাসনার অন্যরকম প্রকাশ। সমাজে সবসময়ে সকল পরিবেশে মানুষ সরাসরি সব বাসনার প্রকাশ ঘটাতে পারে না – তাই তাকে নানা কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করতে হয়। যেমন ‘জিনের বাদশা’ গল্পের নায়ক করেছে। তার আপাতকঠিন মনোভাবের ভেতরে লুকানো আছে দয়ালু প্রেমময় হৃদয়। ‘জিনের বাদশা’ হিসেবে নিজেকে আল্লারাখা যে উপস্থাপন করেছে তা হলো কৌশল। অন্যভাবে মনের ভাবপ্রকাশ – যেখানে সরাসরি নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, সেখানেই মানুষ এই কৌশলের আশ্রয় নেয়। লেখক কিন্তু আমাদের বলেছেন, জিন-ভূত হলো মানুষের অন্যরকম রূপ, অন্যরকম প্রকাশ।  
‘জিনের বাদশা’ গল্পে শব্দের ব্যবহার, নামের ব্যবহার সত্যিই আলাদা। এমন ধরনের সাহসী ব্যবহার সহজেই চোখে পড়ার মতো। যেমন, চুন্নু ব্যাপারী বলেন, ‘আরে, ওরেই কয় – খোদায় দেয় তো জোলায় দেয় না। আল্লা মিঞা এ-হুকুমই দিয়েছেন চারড্যা বিবি আনবার তা কপালে নাই অইবো কোহনথ্যা।’ (‘জিনের বাদশা’, পৃ ১৬১) লেখক এ-গল্পের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। নজরুলের শব্দের ব্যবহার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক আলোচনা-সমালোচনা আছে। তাঁর শব্দ ব্যবহারের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষাচিন্তা নিয়েই অনেকে কথা বলেছেন। নজরুল বাংলা কাব্য ও গদ্যের ভাষায় যে ‘পৌরুষ’ ও ‘তেজস্বিতা’, যে ‘দৃপ্ততা’ ও ‘অভয়’ – ‘দ্রোহ’, ‘ক্ষোভ’ ও লালিত্যময় ইন্দ্রিয় চেতনা এনেছিলেন এর আগে আমরা তা পাইনি। তাঁর অজস্র গান, কবিতা, নাটক, গদ্য ও অভিভাষণে যে-আবেগ ও প্রাণোন্মত্ততা ছড়িয়ে আছে তার মূল ভিত্তি তাঁর শব্দ ও ছন্দের অপূর্ব সম্মিলন। সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি যেমন একটি ক্যানভাসে দেখেছিলেন, তেমনি সমগ্র বাঙালির হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যকে, কোরান-পুরাণের বাণীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে ‘বাঙালির জয় হোক’ বলে প্রার্থনা করেছিলেন নজরুল। (আলম : ২০০৭)  
‘অগ্নি-গিরি’ নজরুলের একটি প্রতিবাদী গল্প, প্রতীকী প্রতিবাদ এবং বাস্তবিক প্রতিবাদ। গল্পটা ঠিক জাতির প্রতীক। মানুষের সহ্যের একটা সীমা থাকে – একটা সময় থাকে। এক সময়ে সে প্রতিবাদী হয়, সংগ্রামী হয়। সে-কথাই লেখক এখানে দেখিয়েছেন মাদ্রাসা-ছাত্র সবুরের মাধ্যমে। সবুরের সাহস আছে, সহ্যক্ষমতা আছে – ভালো- মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। যখনই সে প্রেমের অনুভূতি লাভ করল – তখনই সে ঘুরে দাঁড়ায়। প্রতিরোধ করে প্রতিহত করে – সাফল্য হাতের মুঠোয় এমনিতেই ধরা দেয়। এ-গল্পে লেখক দেখাতে সফল হয়েছেন, প্রেমই মানুষকে সাহসী করে, প্রতিবাদী করে। প্রেম ও সাহস মানুষকে সহজেই সফলতা দেয়।  
সমাজের প্রথাগত ধারণা, গরিব অনগ্রসর পরিবারের ছেলেরাই সাধারণত মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। তারা বোকা ধরনের হয়। লেখক জানাচ্ছেন, ‘পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসাপড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে।’ (‘অগ্নি-গিরি’, পৃ ১৭৮) বাংলাদেশের মৌলবিদের প্রতি লেখকের একটা ক্ষোভ আছে। নজরুলের লেখায় সে গদ্যে হোক আর কাব্যে হোক মৌলবিদের একটা না একটা খোঁচা দেবেনই। বাংলায় থাকেন – বাংলায় বলেন – কথা কিন্তু মৌলবিরা বাংলায় বলেন না। কথা বলেন হয়তো উর্দুতে নয়তো হিন্দিতে। লেখকের ভাষায়, ‘সন্ধ্যায় যখন মৌলবী সাহেব ওয়াজ করছেন এবং ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর কথা যত বুঝতে না পারছে তত ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠছে – তখন সহসা মজলিসের এক কোনায় অসহায় ভেকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল। … আর ওয়াজ হল না সেদিন।’ (‘অগ্নি-গিরি’, পৃ ১৮৩) এখানেও আমরা প্রতিবাদ দেখতে পাই। দেশের মানুষ ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। শুধু স্কুল-কলেজের ছাত্ররা নয়, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মাদ্রাসার ছাত্ররাও হঠাৎ মারমুখী হয়ে উঠেছে – অন্যায়, অবিচার, জুলুম-দুঃশাসন লোকে আর হজম করছে না। মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে। মাদ্রাসার ছাত্র সবুর প্রতিবাদী হওয়া মানে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জেগে ওঠার কাহিনি। সবুর হয়ে উঠেছে সমাজের প্রতিরোধের প্রতীক। নজরুলের প্রতিটি ভালোবাসার গল্পের মধ্যে নিহিত আছে একটা রাজনৈতিক দর্শন। জাগরণের বাণী। প্রতিরোধের আগুন। ‘ভারতীয় উপমহাদেশের চরম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও তিনি পরম অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি সর্বদা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল মানবেতর ঔপনিবেশিক দাসত্ব ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি। তাঁর ভাবনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙালির জন্যে তৈরি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি বিরাট ঠিকানা। এক্ষেত্রে নজরুল বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অদ্বিতীয়। (খান : ২০০৯)  
নজরুলের রচিত তিনখানা গল্পগ্রন্থের শেষখানার নাম শিউলিমালা (১৯৩১)। ‘শিউলিমালা’ গল্পটি একেবারে নির্ভেজাল প্রেমের গল্প। আগেই একবার উল্লেখ করেছি, নজরুলের প্রতিটি গল্পের সুর এক, বেদনা এক – সবই যেন একই সুতায় গাঁথা। আজহার এবং শিউলি দুজনেই সমাজের ওপরতলার মানুষ। তাদের জীবনাচরণ একটু ভিন্ন ধরনের। তাদের উভয়ের মনের ভাব এক ¬- কেউ সহজে প্রকাশ করতে পারে না – শুধু অনুভব করে। তাদের প্রেমের ভাষা ও ভাব অন্যদের চেয়ে আলাদা। নজরুলের অন্য গল্পের চেয়ে ‘শিউলিমালা’ গল্প নানাভাবে আলাদা – ভাষায় ও ভাবে। এ-গল্পের ছোট-বড় সব চরিত্রই শিক্ষিত উঁচুতলার। তাদের আলাপের বিষয়, ভাবনার বিষয়, চিন্তার বিষয় সবই আলাদা। এতে আমাদের সমাজের একটা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। সমাজের রুচির ও সংস্কৃতির পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। আমরা সকলেই জানি, নজরুলের জন্ম পদানত ভারতে হলেও তাঁর জীবনের এ-সময়ে তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে – তারই বৈশিষ্ট্য ‘শিউলিমালা’।  
ঔপনিবেশিক আমলে সমাজের বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনধারায় একটা ভাঙন দেখা দেয়, সামন্ত সংস্কৃতি, জিন-ভূতের প্রভাব দেখা যায়। আর অন্যদিকে শিক্ষিত সমাজের সংস্কৃতিতে জিন-ভূতের স্থানে সংগীত ও ফুলের আগমন ঘটে। একটা সমাজের সংস্কৃতির এই যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন – সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, তা দেখার ক্ষমতা ও চোখ সকলের থাকে না। ‘শিউলিমালা’ গল্পে আমরা দেখতে পাই, সমাজের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের চিত্র লেখক বড় একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতো সফলভাবে তুলে ধরেছেন। একজন অতি বড়মাপের, মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সমাজের এমন সূক্ষ্ম পরিবর্তন শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব। তাই আমরা দেখতে পাই, সমগ্র বাঙালি জাতির ভাবনা, বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তর নজরুলের গল্পের মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। গল্পগুলো যেন যুগের, সময়ের, সমাজের ও সর্বোপরি মানুষের জীবনের জীবন্ত বিবরণ, তাদের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখের কাহিনি। সাহিত্য মানুষের, সময়ের ও সমাজের শৈল্পিক চিত্র। নজরুল ইসলামের গল্পের, মানে সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব হলো, সময় ও মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির বিচার ও বয়ান।

বরাত  
১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গল্প-সমগ্র, কাজী সব্যসাচী এবং অন্যান্য-সম্পাদিত (কলকাতা, সাহিত্যম্, ১৯৯১)।  
২. আবুল ফজল, নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাহবুবুল হক-সম্পাদিত (ঢাকা : সময়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ ২৫।  
৩. আমিন ইসলাম, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯১), পৃ ৫২-৮৯।  
৪. শফিউল আলম, শিক্ষাভাবনা ও ভাষাচিন্তা, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : মনীষা, ২০০৭), পৃ ২১।  
৫. আফজালুল বাসার-সম্পাদিত ও অনূদিত, বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) ভূমিকা, পৃ ৪২।  
৬. সাদাত উল্লাহ খান, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কাজী নজরুল ইসলাম’, বিদ্রোহী কবি ও বঙ্গবন্ধু, মুহম্মদ নুরুল হুদা-সম্পাদিত (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯), পৃ ৯৭।  
৭. মুহম্মদ নূরুল হুদা, ‘জন্মশতবর্ষের নজরুল : বিভিন্ন বিবেচনা’, প্রতিবুদ্ধিজীবী : নজরুল জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, সাদাত উল্লাহ খান-সম্পাদিত (ঢাকা : প্রতিবুদ্ধিজীবী, ১৯৯৯), পৃ ২৮।  
৮. সলিমুল্লাহ খান, ‘স্বাধীনতা ব্যবসায় এস্তেহার’, নতুন ধারা, ১৫ মার্চ ২০১১, পৃ ২৪-৩১।  
৯. Diana Laurenson and Alan Swingewood, The Sociology of Literature (London : Granada Publishing Limited, 1972), p 23.ρ

তথ্য সূত্রঃ kaliokalam.com